দৈনিক ইত্তেফাক

72

তারিখ ... JUN. 15 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

সাঁওতাল ভাষায় প্রথম বিদ্যালয়

তৌফিকুল ইসলাম

রাজশাহী নবাবগঞ্জ মহাসড়ক থেকে বর্ষপাড়া নামে সাঁওতাল গ্রামে পৌঁছাতে আধঘন্টা সময় লাগে। পাঁচ কিলোমিটার দূরবর্তী গ্রামটিতে মোটর সাইকেল ছাড়া অন্য কোন যানবাহনে পৌঁছান সম্ভব নয়। গ্রামের দুই হাজার সাঁওতাল পরিবারে দশ হাজার জনসংখ্যাবিশিষ্ট এই জনপদে একটি টিউবঅয়েল ও পাকা রাস্তাটি আধুনিক জগতের একমাত্র নিদর্শন। যখন গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রচার ও প্রসার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র এই গ্রামটিতে উন্মোচিত হচ্ছে। প্রথম এবং একমাত্র সাঁওতাল বিদ্যালয়টি এলাকার সাঁওতাল অধিবাসীদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত।

উন্নয়নের জন্য গণশিক্ষা আধুনিকতার ক্রমবিকাশে ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে। বাস্তবতার রূপান্তর ও তাকে সংরক্ষণ, প্রগতিশীল চিন্তাবিদগণের শিক্ষা কার্যক্রমের একটি প্রকল্প, যা প্রচলিত জ্ঞান প্রবাহ করার প্রচলিত ধারণার বিপরীতে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে একটি দেশে শিক্ষাকে সামাজিক-রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক গতিশীলতার দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে। উন্নয়নশীল বিশ্বে শিক্ষাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়। শিক্ষা সম্পর্কিত বহু পরিকল্পনা সংস্থা স্বীকার করে যে, শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে মাথাপিছু আয় বর্ধনের সম্পর্ক রয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের যথাক্রমে ৬৪% ও ৫১% শিক্ষিতের হার স্বীকার করা হয় সরকারীভাবে। কিন্তু উপজাতি এলাকায় প্রকৃতপক্ষে এ হার শূন্য। এ সকল কেন্দ্রের এক একটি অংশ অনুন্নত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থার অবস্থা খুব খারাপ। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী, সার্বিক শিক্ষা আন্দোলন, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী প্রভৃতি সুফল বয়ে আনলেও উপজাতি জনগোষ্ঠী বিপুল সংখ্যায় এই কর্মসূচীর আওতার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। ভাষা পার্থক্যের কারণে এ জনগোষ্ঠী দেশের সার্বিক শিক্ষা কর্মসূচীর বাইরে থেকে যাচ্ছে।

পুরুষ ও মহিলাদের যথাক্রমে ৬৪% ও ৫১% শিক্ষিতের হার স্বীকার করা হয় সরকারীভাবে। কিন্তু উপজাতি এলাকায় প্রকৃতপক্ষে এ হার শূন্য। এ সকল কেন্দ্রের এক একটি অংশ অনুন্নত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থার অবস্থা খুব খারাপ। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী, সার্বিক শিক্ষা আন্দোলন, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী প্রভৃতি সুফল বয়ে আনলেও উপজাতি জনগোষ্ঠী বিপুল সংখ্যায় এই কর্মসূচীর আওতার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। ভাষা পার্থক্যের কারণে এ জনগোষ্ঠী দেশের সার্বিক শিক্ষা কর্মসূচীর বাইরে থেকে যাচ্ছে।

বিগত শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সাঁওতাল সম্প্রদায় দেশের এ অংশে বসবাস শুরু করে। ১৮৪৭ সালে যখন ব্রিটিশ শাসন এ অঞ্চলে রেলওয়ে স্থাপনের কাজ শুরু করে সাঁওতালরা শ্রমিক হিসাবে আসে এবং স্থায়ী বসবাস গড়ে তোলে। এই সম্প্রদায়ের মূল আবাসস্থল ভারতের মধ্যাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চল নিয়ে গঠিত এলাকায়। তারা এ অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে বসবাস করে আসছে। সাঁওতাল ভাষা দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম প্রাচীন ভাষা। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার আধুনিক ভাষাগুলো অপেক্ষাও প্রাচীন। এই ভাষা মৌখিকভাবে স্থানান্তরযোগ্য। এর একটি শক্তিশালী ঐতিহ্য আছে। শতবর্ষব্যাপী রাষ্ট্র ও সমাজের অবহেলার কারণে প্রাচীনতম এই গোষ্ঠীর বসতি দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে। ১৮৯৬ সালে লুথারিয়ান মিশন এবং ১৯০৯ সালে ক্যাথলিক মিশন সাঁওতালদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের পূর্ণ প্রচেষ্টা চালু রেখেছিল। এমনকি ক্যাথলিক মিশন সাঁওতাল ভাষা রোমান অক্ষরে লেখার রীতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চালায় এবং সাঁওতাল ভাষায় বই-পুস্তক প্রকাশের জন্য একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে। সাঁওতাল ভাষায় প্রকাশিত কিছু পুস্তক পত্রিকা কোলকাতাস্থ এশিয়াটিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদি সম্প্রদায় ও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যকার দূরত্ব কমানোর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। সাঁওতালদের কথ্য ভাষাকে লেখ্যরূপ দানের প্রচেষ্টা নেয়া হয় আলজিকি নামক একটি পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, এটি সম্পূর্ণতা পায়নি। কিন্তু তারা একটি শিক্ষানীতি প্রবর্তনে সফল হয়। যার মাধ্যমে এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী ভাষা সমস্যা দূরীভূত করা যায়। তিন স্তর-বিশিষ্ট শিক্ষানীতির মৌলিক বিষয় যে প্রতিটি মানুষের শিক্ষালাভের অধিকার আছে তার নিজের মাতৃভাষায় এবং প্রায় দুইদশক ধরে চালু রয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের এবং ইংরেজী অথবা হিন্দির মাধ্যমে সর্বশেষ স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা নেয়া হয়। আঞ্চলিক ভাষাসমূহের উন্নয়নকল্পে সম্প্রতি কিছু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ভাষা জনগোষ্ঠী এই নীতি অবলম্বনের ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে এভাবে যে, তারা বৃহৎ ভাষা ও শিক্ষা আয়ত্ত করতে শিখেছে। যাতে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর হয়েছে। তাছাড়াও এ শিক্ষা তাদের চাকুরী বাজারে প্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ফলে নিজেদের সমাজে বস্তুগত পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাগত মূল্যবোধের পরিবর্তন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূল সমাজের সঙ্গে মিশে যাওয়ার এ লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষুদ্র ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের এবং বহিরাগত মানুষের উৎসাহ দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘ এবং ইউনেস্কো ক্ষুদ্র জাতির নিজস্ব ভাষা সংরক্ষণের অধিকার ব্যক্ত করেছে। কতিপয় ইউরোপীয় সংসদীয় কার্যবিবরণীতে উপজাতীয় ভাষা শিক্ষা প্রসারে এবং সরকারী কাজকর্মে ব্যবহারের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। প্রস্তাবিত ইউরোপীয়ান চার্টার রিজিওনাল এন্ড মাইনোরিটি ল্যাংগুয়েজ-এরও একই রকমের লক্ষ্য রয়েছে। বাংলাদেশ যে একটি এক ভাষাভিত্তিক দেশ এই প্রচলিত ধারণায় ক্ষুদ্র ভাষা গোষ্ঠীর প্রতি লজ্জাজনক অবহেলার একটি কাঠামো তৈরীতে সহায়তা করেছে।

মাত্র অর্ধশতক বছর আগে যে জনগোষ্ঠী ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে, যুদ্ধ করেছে তাদের ক্ষেত্রে এটি একটি নোংরা মুখচ্ছবি প্রকাশের সামিল করে। এই ধরনের নীতি প্রস্তুতের ফলে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের সৃষ্টি করে। যা পরিশেষে রাজনীতি এবং অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রতিককালের পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সমস্যা এ সত্যকে নিশ্চিত করবে। প্রকৃত সত্য এই ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যমই নয় সামাজিকীকরণেরও এটা একটা পৃথক সত্তার চিহ্ন এবং ঐক্যের প্রধান হাতিয়ারও বটে। ভাষার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার বাধা ভাষা ব্যবহারকারীদের পক্ষ থেকেই আসবে। এই বাধা অবদমন ও অবদমিতের সম্পর্কের জন্ম দেয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়। অবদমিতের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনেরও সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ঔপনিবেশিক মন-মানসিকতার কারণে এই ধরনের সম্পর্ক প্রশাসন ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় বিদ্যমান। সচেতন সরকার এ সম্পর্ককে ভেঙ্গে দেয়া উচিত। আমাদের এবং উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের নতুন দিক যেন উন্মোচিত হয়। এ ক্ষেত্রে উপজাতীয় বিদ্যালয়ই সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। আদিবাসীদের ভাষা, ভাষা বিজ্ঞান, সামাজিক ভাষা বিজ্ঞানের একটি শক্তিশালী তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সরকারের বাস্তবধর্মী ভাষানীতি প্রণয়ন করা সহজ হবে।